সম্পাদকীয়

editorialamarbarta@gmail.com

সিসা দূষণের উৎস শনাক্ত করে পদক্ষেপ নিন

সিসা নীরব ঘাতক। গন্ধহীন, স্বাদহীন ও অদৃশ্য বিষাক্ত এই ভারী ধাতু মানুষের স্বাস্থ্যকে তিলে তিলে ধ্বংস করে। বিশেষ করে শিশুদের বিকাশে মারাত্মক প্রভাব ফেলে। উদ্বেগের বিষয় হলো, বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে মাত্রাতিরিক্ত সিসার উপস্থিতি রয়েছে, যা নানাভাবে মানবদেহে প্রবেশ করছে এবং ভয়াবহ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে জানা যায়, শিল্পাঞ্চলের আশপাশে বসবাসকারী প্রতি ১০ শিশুর মধ্যে আটজনের শরীরে ঝুঁকিপূর্ণ মাত্রায় সিসা রয়েছে। গর্ভবতী মায়েদের শরীরেও ক্ষতিকর মাত্রায় সিসার উপস্থিতি পাওয়া গেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, রক্তে প্রতি ডেসিলিটারে পাঁচ মাইক্রোগ্রামের বেশি সিসার উপস্থিতি উদ্বেগজনক। এদিকে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ও ইউনিসেফের ২০২৫ সালের জরিপে দেখা গেছে, শিল্পাঞ্চলের কাছাকাছি বসবাসকারী ৮০.৬ শতাংশ শিশুর রক্তে সিসার মাত্রা প্রতি ডেসিলিটারে পাঁচ মাইক্রোগ্রাম বা তার বেশি। ১২ থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুদের ৩৮.৪ শতাংশের রক্তে সিসার মাত্রা প্রতি ডেসিলিটারে পাঁচ মাইক্রোগ্রাম বা তার বেশি। অর্থাৎ পাঁচ বছরের কম বয়সী প্রতি ১০ শিশুর প্রায় চারজন সিসার ঝুঁকিতে।

অন্যদিকে গর্ভবতী নারীদের ৭.৫ শতাংশের রক্তেও সিসার মাত্রা নির্ধারিত সীমায় বা তার বেশি পাওয়া গেছে। বিবিএসের জরিপের বিভাগভিত্তিক হিসাব বলছে, শিশুদের রক্তে সিসার উপস্থিতির হার সবচেয়ে বেশি ঢাকা বিভাগে। এই বিভাগের ৬৫.২ শতাংশ শিশুর রক্তে সিসার মাত্রা নির্ধারিত সীমার বেশি। সিলেটে এই হার ৪৬.৭ শতাংশ এবং চট্টগ্রামে ৪২.১ শতাংশ। ময়মনসিংহে ৩০.৬ শতাংশ, বরিশালে ২৯ শতাংশ, রংপুরে ১৯.৬ শতাংশ, খুলনায় ১৭.৮ শতাংশ এবং রাজশাহীতে ...

অন্যদিকে গর্ভবতী নারীদের ৭.৫ শতাংশের রক্তেও সিসার মাত্রা নির্ধারিত সীমায় বা তার বেশি পাওয়া গেছে। বিবিএসের জরিপের বিভাগভিত্তিক হিসাব বলছে, শিশুদের রক্তে সিসার উপস্থিতির হার সবচেয়ে বেশি ঢাকা বিভাগে। এই বিভাগের ৬৫.২ শতাংশ শিশুর রক্তে সিসার মাত্রা নির্ধারিত সীমার বেশি। সিলেটে এই হার ৪৬.৭ শতাংশ এবং চট্টগ্রামে ৪২.১ শতাংশ। ময়মনসিংহে ৩০.৬ শতাংশ, বরিশালে ২৯ শতাংশ, রংপুরে ১৯.৬ শতাংশ, খুলনায় ১৭.৮ শতাংশ এবং রাজশাহীতে ১৫.৯ শতাংশ।

জাতীয় গড় ৩৮.৪ শতাংশ। এমন বাস্তবতায় বাংলাদেশে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক সিসা বিষক্রিয়া প্রতিরোধ সপ্তাহ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে ১৮ থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত চলা এই কর্মসূচির প্রতিপাদ্য 'শনাক্তকরণ থেকে প্রতিরোধ'। প্রধান লক্ষ্য হলো, সিসার বিষক্রিয়া ঘটার আগেই দূষণের উৎস শনাক্ত করে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া।

সিসাদূষণের উৎস কী? শিল্পবর্জ্য, পুরনো ব্যাটারি পুনর্ব্যবহার, দূষিত ধুলা-মাটি, রং ও বিভিন্ন পণ্যের মাধ্যমে সিসা মানুষের শরীরে প্রবেশ করছে। এ ছাড়া খেলনা, প্রসাধনী, খাবার, গৃহস্থালি পণ্য বা শহরের পরিবেশের দূষিত ধুলা-মাটি এর সম্ভাব্য উৎস হতে পারে। রাজধানীতে পাইপের পানির সংযোগ থাকা পরিবারের শিশুদের মধ্যে সিসার মাত্রা বেশি পাওয়া গেছে। অন্যদিকে দরিদ্র পরিবারের তুলনায় ধনী পরিবারে শিশুদের শরীরে তুলনামূলক বেশি মাত্রায় সিসার উপস্থিতি দেখা গেছে। এসব বিষয়ে পৃথক ও বিস্তারিত গবেষণা হওয়া জরুরি। হতাশার দিক হলো, শিশুদের বিকাশে সিসা মারাত্মক ক্ষতিকর হলেও এ নিয়ে তেমন সচেতনতা নেই বললেই চলে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শৈশবে সিসার সংস্পর্শ মস্তিষ্কের বিকাশ, শেখার ক্ষমতা ও আচরণে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি করতে পারে। গর্ভাবস্থায় সিসার সংস্পর্শও উদ্বেগজনক। কারণ সিসা মায়ের শরীর থেকে ভ্রূণের কাছে পৌঁছতে পারে।

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশের (আইসিডিডিআরবি) গবেষণা কর্মকর্তা সুহান আহমেদ বলেন, সিসার বিষক্রিয়া গুরুতর জনস্বাস্থ্যঝুঁকি হলেও তা প্রায়ই চোখে পড়ে না। এটি শিশুদের বিকাশ এবং সমাজে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য হুমকি। তাই বিষয়টিকে ছোট সমস্যা হিসেবে না দেখে জনস্বাস্থ্যের বড় জরুরি অবস্থা হিসেবে বিবেচনা করে এখনই পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

সিসাদূষণ শনাক্ত ও পর্যবেক্ষণের জন্য রক্ত ও পরিবেশগত নমুনা পরীক্ষার সক্ষমতা বাড়াতে হবে বলে আমরা মনে করি। নিয়মিত পরীক্ষা, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা নির্ধারণ এবং দূষণের উৎস শনাক্ত করা প্রয়োজন। যেসব শিল্পবর্জ্য থেকে দূষণ ছড়িয়ে পড়ছে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহি করা দরকার। সর্বোপরি পরিবেশ, স্বাস্থ্য, শিল্প ও ভোক্তা সুরক্ষা সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়া একান্ত অপরিহার্য।

ধর্ম ও চিন্তা

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে আত্মনিয়ন্ত্রণ জরুরি

আবিদ রহমান

নানা ধরনের ক্ষতির কারণ মোবাইল। বিশেষ করে শিশু-কিশোর ও শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে মোবাইলের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও ভবিষ্যৎ গঠনে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। তাই মোবাইল ফোনের সঠিক ও পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। ব্যক্তিগত সচেতনতা, সময়ের সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং পরিবারের সহযোগিতার মাধ্যমে মোবাইল ব্যবহারের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। প্রযুক্তির সুফল গ্রহণ এবং কুফল থেকে বাঁচতে মোবাইল নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব অপরিসীম।

বর্তমান যুগকে বলা হয় তথ্য ও প্রযুক্তির যুগ। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ আজ ফেসবুক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম, এক্স (টুইটার), টিকটকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত।

প্রযুক্তির এই বিস্ময়কর অগ্রগতি মানবজীবনকে যেমন সহজ করেছে, তেমনি নতুন কিছু চ্যালেঞ্জও সৃষ্টি করেছে। আজ অনেকের দিন শুরু হয় মোবাইলের স্ক্রিন দেখে, আর শেষ হয় সোশ্যাল মিডিয়ার নিউজফিড স্ক্রল করতে করতে। ফলে অজান্তেই প্রযুক্তি মানুষের জীবন পরিচালনার একটি শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠেছে।

নামাজে যেমন ইমাম সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন আর মুক্তাদি তাঁর অনুসরণ করেন, তেমনি আধুনিক সমাজে অনেক মানুষের জীবনযাত্রা, চিন্তাভাবনা, পছন্দ-অপছন্দ, এমনকি মূল্যবোধও অনেকাংশে সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যালগরিদম দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

একজন মুমিনের জন্য এটি গভীরভাবে ভাবনার বিষয়। কারণ ইসলাম মানুষকে পরিস্থিতির দাস নয়, বরং আত্মনিয়ন্ত্রিত, সচেতন ও দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। তাইতো আল্লাহ তাআলা বলেন, 'সময়ের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।' (সুরা আসর : আয়াত ১-২)

বর্তমানে অসংখ্য মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাটিয়ে দেন, অথচ দিনের শেষে উপলব্ধি করেন যে তারা উল্লেখযোগ্য কোনো উপকারই অর্জন করেননি। ইসলাম আমাদের শিক্ষা দেয়, প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব একদিন আল্লাহর কাছে দিতে হবে। মহানবী (সা.) বলেন, 'কিয়ামতের দিন বান্দার পদযুগল নড়বে না, যতক্ষণ না তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে–তার জীবন কোথায় ব্যয় করেছে।' (তিরমিজি, হাদিস: ২৪১৭)

সুতরাং সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যয় করা প্রতিটি মিনিটও আমাদের আমলনামার অংশ।

যেভাবে চিন্তার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলছেন : সোশ্যাল মিডিয়ার অন্যতম বড় প্রভাব হলো এটি মানুষের চিন্তাকে প্রভাবিত করে। কী ট্রেন্ডিং, কী জনপ্রিয়, কে কী বলছে–এসব দেখে অনেক মানুষ নিজের বিবেক ও বিচারশক্তির পরিবর্তে জনমতের অনুসারী হয়ে যায়।

মহান আল্লাহ বলেন, 'যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তার অনুসরণ করো না।'(সুরা : ইসরা, আয়াত : ৩৬)

এই আয়াত আমাদের শিক্ষা দেয় যে অন্ধ অনুসরণ নয়, বরং যাচাই-বাছাই করে সিদ্ধান্ত নেওয়াই একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে এটি আরও বেশি প্রাসঙ্গিক।

ইসলাম মানুষের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার শিক্ষা দেয়। একজন মুমিন কখনো তার ইচ্ছা, আবেগ কিংবা পরিবেশের অন্ধ অনুসারী হয় না। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যে ব্যক্তি তার রবের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং নিজের নফসকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখে, তার আবাস হবে জান্নাত।;' (সুরা : নাজিআত, আয়াত : ৪০-৪১)

আজকের দিনে নফসের অন্যতম বড় পরীক্ষা হলো উদ্দেশ্যহীন স্ক্রলিং, সময় অপচয় এবং ডিজিটাল আসক্তি। একজন সচেতন মুসলিমকে এসব বিষয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণ গড়ে তুলতে হবে। মহানবী (সা.) বলেন, 'মানুষের ইসলামের সৌন্দর্যের অন্যতম লক্ষণ হলো, সে অনর্থক বিষয়

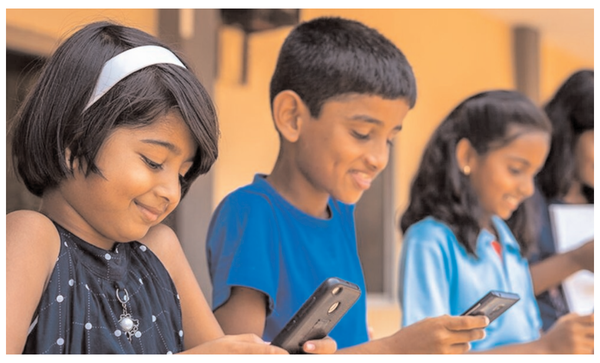

পরিত্যাগ করে।' (তিরমিজি, হাদিস : ২৩১৭)

সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন অসংখ্য বিষয় রয়েছে যা মানুষের দুনিয়া ও আখিরাত–উভয়ের জন্যই কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না। একজন মুমিনের উচিত উপকারী জ্ঞান, ইসলামী শিক্ষা, ব্যবসায়িক দক্ষতা, শিক্ষামূলক বিষয় এবং সমাজকল্যাণমূলক কনটেন্টকে অগ্রাধিকার দেওয়া। আর সোশ্যাল মিডিয়াকে মুক্তাদি বানানোর অর্থ প্রযুক্তি বর্জন করা নয়; বরং প্রযুক্তিকে নিজের লক্ষ্য ও মূল্যবোধের অধীনস্থ করা। অর্থাৎ– আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার দাস হব না, আমরা সময় নির্ধারণ করে ব্যবহার করব, অপ্রয়োজনীয় স্ক্রলিং কমিয়ে আনব, উপকারী ও শিক্ষামূলক কনটেন্ট অনুসরণ করব, গিবত, অপবাদ, অশ্লীলতা ও ফিতনা থেকে দূরে থাকব, প্রযুক্তিকে দ্বীনের খেদমত, জ্ঞান অর্জন ও আত্মউন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করব ইত্যাদি। যখন প্রযুক্তি আমাদের নিয়ন্ত্রণ করবে না, বরং আমরা প্রযুক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করব–তখনই সোশ্যাল মিডিয়া মুক্তাদি হবে আর আমরা নিজেদের জীবনের ইমাম হতে পারব।

একজন মুমিনের ডিজিটাল নীতিমালা : ১. দিনের নির্দিষ্ট সময়ে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করা।
২. ফজর ও এশার পর অপ্রয়োজনীয় মোবাইল ব্যবহার কমানো।
৩. প্রতিদিন কিছু সময় কোরআন তিলাওয়াত ও ইসলামী জ্ঞানার্জনের জন্য নির্ধারণ করা।
৪. কোনো খবর শেয়ার করার আগে যাচাই করা।
৫. গিবত, তর্ক-বিতর্ক ও অশ্লীল কনটেন্ট থেকে দূরে থাকা।
৬. বাস্তব জীবনের পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও সমাজের সঙ্গে সম্পর্ককে অগ্রাধিকার দেওয়া।
৭. প্রতিদিন নিজের স্ক্রিন টাইম পর্যালোচনা করা।

সোশ্যাল মিডিয়া একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এটি মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি করতে পারে, আবার সময় ও চিন্তার স্বাধীনতাও কেড়ে নিতে পারে। তাই একজন মুমিনের দায়িত্ব হলো প্রযুক্তিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখা, প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণে চলে না যাওয়া। ইসলাম আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ, সচেতনতা এবং সময়ের মূল্য শেখায়।

সুতরাং আসুন, আমরা সোশ্যাল মিডিয়াকে আমাদের জীবনের ইমাম না বানিয়ে তাকে মুক্তাদির আসনে বসাই। আমাদের চিন্তা, সময়, আমল এবং জীবন পরিচালনার নেতৃত্ব যেন থাকে কোরআন, সুন্নাহ ও বিবেকের হাতে। তখনই আমরা প্রযুক্তির সুফল ভোগ করতে পারব এবং দুনিয়া ও আখিরাত–উভয় ক্ষেত্রেই সফলতার পথে এগিয়ে যেতে পারব। মনে রাখতে হবে, একজন মুমিনের হাতে প্রযুক্তি একটি উপকারী হাতিয়ার; কিন্তু প্রযুক্তির হাতে একজন মুমিন কখনো খেলনা হতে পারে না।

লেখক : তরুণ আলেম ও গণমাধ্যমকর্মী

বহির্বিশ্বের রাজনীতি এবং মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতা

সীমানা পেরিয়ে

রায়হান আহমেদ তপাদার
গবেষক ও কলামিস্ট

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মধ্যপ্রাচ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বহন করে। যাকে কেন্দ্র করে প্রতিনিয়ত আবর্তিত হয় বিশ্বরাজনীতির মঞ্চ। বর্তমানে বিশ্বরাজনীতির প্রাণকেন্দ্র হলো এই মধ্যপ্রাচ্য। বলাবাহুল্য তা অতীতেও বিরাজমান ছিল, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি তথা অবস্থার সাপেক্ষে তা নেহায়েত কম প্রভাবই ফেলত আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে। মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতির অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক অবস্থার দৃশ্যপট অনুধাবন কিংবা রাজনৈতিক অস্থিরতার চিন্তার ভাঁজ খোলা এবং সহজে এ সমস্যা উদ্ধার করার জন্য শুধু এর ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে অবস্থানরত দেশগুলোতে সীমাবদ্ধ থাকলে এর মূল উদ্ঘাটন সম্ভবপর নয়, দরকার আন্তর্জাতিক মানদন্ডে রাজনৈতিক অনুসন্ধান। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং শক্তিশালী দেশ হলো সৌদি আরব ও ইরান। ক্ষমতার দিক থেকে দুই দেশের দ্বন্দ্ব বহু দিনের। প্রভাব বিস্তারের রাজনীতি বা মোড়লিপনার রাজনীতিতে এই দুই দেশের কেউ পিছিয়ে নেই। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি ও শক্তি অর্জন করায় আমিরাত মধ্য পূর্বাঞ্চলের রাজনীতি এবং জিওপলিটিকসে এক অপরিহার্য খেলোয়াড় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং মধ্যপ্রাচ্যের আঞ্চলিক রাজনীতিতে রিজিওনাল পাওয়ার কেন্দ্রিক প্রতিযোগিতায় সৌদি আরবের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। উল্লেখ্য যে, মধ্যপ্রাচ্যে দুটি শক্তি সৌদি আরব ও ইরান আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে স্থান করে নেওয়ার জন্য যুগ যুগ ধরে প্রতিযোগিতা করে আসছে এবং এ প্রতিযোগিতায় শামিল হয়েছে সাম্প্রতিককালে সংযুক্ত আরব আমিরাত, দেশটা এখন অত্রাঞ্চলে একক আঞ্চলিক পরাশক্তি হওয়ার প্রত্যাশা পোষণ করছে। সম্প্রতি সৌদি আরবে ইরান-সমর্থিত হুতিদের সাম্প্রতিক হামলা ইয়েমেন যুদ্ধকে এক নতুন মোড়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

হুতিদের এটি একটি চরম দায়িত্বজ্ঞানহীন বাজি, যা কোনোভাবেই তাদের নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করবে না। তারা খুব ভালো করেই জানে এর পরিণতি এবং পাল্টা হামলা কতটা ভয়াবহ হতে পারে। তারপরও তারা সৌদি আরবে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে মূলত মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচনের ঠিক আগে এই অঞ্চলে উত্তেজনা বাড়াতে ইরানের যে পরিকল্পনা, তা বাস্তবায়নের জন্য। পরিস্থিতি যেহেতু ক্রমেই উত্তপ্ত হচ্ছে, তাই বর্তমান প্রেক্ষাপট দুটি বড় ধরনের দৃশ্যপটের জন্ম দিতে পারে: হুতিদের বিরুদ্ধে একটি বড় আঞ্চলিক সামরিক অভিযান অথবা একটি দীর্ঘস্থায়ী ক্ষয়িষ্ণু যুদ্ধ। যদি সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট এবং ইয়েমেন সরকার নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিভেদ ও মতপার্থক্য মেটাতে ব্যর্থ হয়, তবে হুতিদের বিরুদ্ধে তাদের অগ্রযাত্রা অনেকটাই থমকে যাবে। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে হুতি যোদ্ধারা কেবল নিজেদের অবস্থানই শক্ত করবে না, বরং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ তাইজ শহরের ওপর চাপ বাড়াবে এবং সৌদির বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুতে ধারাবাহিক হামলা চালিয়ে যাবে। এমন পরিস্থিতি সংঘাতকে আরও জটিল করে তুলবে। ফলে বেসামরিক প্রাণহানি ও বাস্তুচ্যুতির ঘটনা বহুগুণ বাড়বে এবং কোনো চূড়ান্ত ফলাফল ছাড়াই যুদ্ধ প্রলম্বিত হতে থাকবে। এর একটি বড় অর্থনৈতিক প্রভাব পড়বে সৌদি আরবের ওপর। প্রতিরক্ষা খাতে অস্বাভাবিক খরচ বেড়ে যাওয়ার ফলে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা কঠিন হয়ে পড়বে। যেহেতু সৌদি আরব এই অঞ্চলের অর্থনীতির চালিকা শক্তি, তাই পুরো উপসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনীতিতেই এর তীব্র নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। তা ছাড়া হুতিদের কাছে ভূখণ্ড হাতছাড়া হওয়ার অর্থ হলো হরমুজ

প্রণালির সংকট অব্যাহত থাকা, যা মধ্যপ্রাচ্য থেকে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি রপ্তানি ব্যাহত করবে।

এই দ্বিতীয় দৃশ্যপটের ফল হবে একটি স্থবির অবস্থা বা অচলাবস্থা, যেখানে কেউ বিজয়ী নয়, কেউ পরাজিত নয়। তবে আড়ালে আসল লাভটা হবে ইরানের।

লোহিত সাগর উপকূলে একটি ক্ষয়িষ্ণু দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চলতে থাকলে তেহরান সামরিক ও রাজনৈতিক চাপ থেকে অনেকটাই হালকা হতে পারবে। এর ফলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ের আলোচনায় ইরান 'হুতি কার্ড'কে দর-কষাকষির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে এবং নিজেদের শর্ত ও দাবিগুলো আরও জোরালো ভাবে তুলে ধরার সুযোগ পাবে। অতএব ইয়েমেন সংকটের একমাত্র সমাধান হলো-ইয়েমেন সরকারের নেতৃত্বে এবং একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক জোটের সমর্থনে একটি চূড়ান্ত ও নির্ণায়ক সামরিক অভিযান। আর তা বাস্তবায়ন করতে হলে ইয়েমেন সরকারকে অবশ্যই সবার আগে নিজের ঘর সামলাতে হবে এবং তাদের মিত্রদের সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে হবে। সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে সম্প্রতি ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা যে হামলা চালিয়েছে, তা মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তা পরিস্থিতিকে এক ভয়াবহ সংকটের দিকে ঠেলে দিয়েছে। বিশেষ করে কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর লক্ষ্য করে চালানো এই আঘাত শুধু বেসামরিক বিমান চলাচল কিংবা সাধারণ মানুষের জীবনহানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই; এটি ওই অঞ্চলের সামরিক ভারসাম্য, বিশ্ব জ্বালানি সরবরাহের নিরাপত্তা এবং সামগ্রিক আন্তর্জাতিক অর্থনীতি নিয়ে বড় ধরনের প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। এখানে মূল বিষয় হচ্ছে; রিয়াদের এই হামলাকে শুধু একটি আঞ্চলিক সংকট হিসেবে দেখলে চলবে না; এটি একটি বড় ধরনের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ধাক্কার শুরু হতে পারে। এ ঘটনার চূড়ান্ত পরিণতি নির্ভর করবে পাল্টা আক্রমণের মাত্রা, কূটনৈতিক উদ্যোগের সফলতা এবং আঞ্চলিক শক্তিগুলোর সংযমের ওপর। সৌদি আরব ইয়েমেনের যুদ্ধে জড়িত থাকা, হুতিদের আধুনিক সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা মিলে এক জটিল পরিস্থিতি তৈরি করেছে। এতে একটি স্থানীয় সংঘাত খুব সহজেই সারা বিশ্বে প্রভাব ফেলছে।

৭ অক্টোবর রয়টার্স জানিয়েছিল, লোহিত সাগর উপকূলের কাছে হুতিরা এগিয়ে এলে সৌদি আরব আবারও ইয়েমেনে সামরিক উপস্থিতি বাড়ায়। এর ফলে সৌদি শহর, বিমান বন্দর ও জ্বালানি অবকাঠামোর ওপর আবারও বড় হুমকি তৈরি হয়। নিরাপত্তার দিক থেকে যে বিষয়গুলো এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তা হচ্ছে, সৌদি আরবের অর্থনীতি ও নিরাপত্তার মূল ভিত্তি হলো বিমানবন্দর, তেলক্ষেত্র, বন্দর ও পরিবহনকেন্দ্র। এসব জায়গায় আঘাত এলে পুরো যাতায়াত ও বাণিজ্যব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, যা দেশটির বিশাল ক্ষতি করে। এ হামলার কারণে সৌদি আরবের ওপর পাল্টা হামলার চাপ বাড়বে। তারা নিজেদের জনগণকে রক্ষা করতে চায়। কিন্তু তারা যদি বেশি মাত্রায় প্রতিশোধ নিতে যায়, তবে হুতিরাও আরও হামলা চালাবে। এতে যুদ্ধের পরিধি বাড়বে এবং ইয়েমেনের সাধারণ মানুষের কষ্ট আরও গভীর হবে এবং আঞ্চলিক জোট গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ১২ অক্টোবর সৌদি আরব, পাকিস্তান, তুরস্ক ও মিসর যৌথভাবে এই হামলার তীব্র নিন্দা জানায়। তারা সৌদি আরবের আত্মরক্ষার অধিকারকে সমর্থন দিয়েছে। এই তিন দেশ সম্মিলিত প্রতিরক্ষাব্যবস্থা জোরদার করতে সম্মত হয়েছে। তবে এই কূটনৈতিক সমর্থনের মানেই যে সবাই সরাসরি যুদ্ধে নেমে পড়বে, তা নয়। গোয়েন্দা তথ্য দেওয়া কিংবা আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থার মতো কাজে সহায়তার সীমা কতটুকু হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। এ হামলাকে বিশ্বরাজনীতির বড় প্রেক্ষাপটে দেখা দরকার। মধ্যপ্রাচ্যে নিজের অবস্থান ধরে রাখা এবং জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সৌদি আরব খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক অংশীদার। বারবার হামলা হওয়ায় ওয়াশিংটনের ওপর চাপ বাড়ছে, যেন তারা সৌদি আরবকে সামরিক ও গোয়েন্দা সহায়তা বাড়িয়ে দেয়। এখন প্রধান প্রশ্ন হলো, যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি যুদ্ধ না করেও হুতিদের থামাতে পারবে কি না। এদিকে হুতিদের সঙ্গে ইরানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও হুতিদের প্রতিটি সিদ্ধান্তই যে সরাসরি তেহরান নিয়ন্ত্রণ করে, তা বলা যায় না।

হুতিদের নিজস্ব রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও কৌশল রয়েছে। ইরানের জন্য সৌদি আরবের তেলব্যবস্থা এবং লোহিত সাগরে বিঘ্ন ঘটাতে পারা একটি রাজনৈতিক সুবিধা হতে পারে। কিন্তু এর ফলে যদি পুরো অঞ্চলে বড় যুদ্ধ বেধে যায়, তবে ইরানকেও তার মাশুল দিতে হবে। তাই ইরান কতটুকু সাহায্য করছে, তাদের প্রভাব কতটুকু এবং হুতিরা কতটা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে-এই তিন বিষয় আলাদাভাবে বিচার করতে হবে। রিয়াদ, ইসলামাবাদ, আঙ্কারা ও কায়রোর এই যৌথ পদক্ষেপ আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। তবে পাকিস্তানের জন্য এটি একটি কঠিন পরীক্ষা। কারণ, তাদের একদিকে সৌদি আরবের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে, অন্যদিকে নতুন কোনো বড় যুদ্ধে জড়ানো থেকে দূরে থাকতে হবে। সৌদি আরবের হুতিবিরোধী সামরিক সক্ষমতা নিয়ে সংশয় নেই। রিয়াদ বিমান হামলা জোরদার করতে পারে, গোয়েন্দা তৎপরতা বাড়াতে পারে, ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করতে পারে। হুতিদের সামরিক অবকাঠামোর বড় ক্ষতি করার সামর্থ্যও তাদের আছে। প্রশ্ন হলো, তাতে কি হুতি সমস্যার সমাধান হবে? ব্যাপক সামরিক অভিযান হুতিদের উৎক্ষেপণস্থল ও কমান্ড অবকাঠামো ধ্বংস করতে পারে। কিন্তু তার পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসেবে সৌদি তেল স্থাপনা, শহর, বন্দর ও জাহাজ চলাচলে হামলা বাড়তে পারে। আবার রিয়াদ সংযত থাকলে হুতিরা বাব আল-মানদেব ঘিরে নিজেদের অবস্থান আরও শক্তিশালী করে দর-কষাকষির ক্ষমতা বাড়াতে পারে।সৌদি আরবের সংকট এখানেই-সংযম ও সংঘাত বৃদ্ধি, দুই পথেই ঝুঁকি আছে। এই প্রেক্ষাপটেই ট্রাম্পের কাছে রিয়াদের সহায়তা চাওয়ার বিষয়টি দেখতে হবে। যুবরাজ সালমান সম্ভবত ওয়াশিংটনকে সৌদি আরবের হয়ে যুদ্ধে নামানোর চেয়ে মার্কিন সামরিক শক্তিকে প্রতিরোধের সমীকরণে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সরাসরি হামলায় ট্রাম্পের অসম্মতি একটি নতুন বাস্তবতা সামনে এনেছে-সৌদি আরবের প্রতিটি নিরাপত্তা সংকটের ঝুঁকি যুক্তরাষ্ট্র নেবে, এমন নিশ্চয়তা আর নেই।

হুতিদের শক্তির জায়গাটিও এখানে। অর্থ, অস্ত্র ও সামরিক সক্ষমতায় তারা সৌদি আরবের ধারেকাছেও নেই। কিন্তু অসম যুদ্ধের সুবিধা তাদের পক্ষে। একটি সস্তা ড্রোন ঠেকাতে ব্যয়বহুল ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়তে হয়। একটি পাইপলাইনে সফল হামলাই বিপুল তেল রপ্তানি ব্যাহত করতে পারে। কোনো ট্যাংকার না ডুবিয়েও জাহাজে হামলার বিশ্বাসযোগ্য হুমকি বিমার খরচ বাড়িয়ে দিতে পারে। আর বাব আল-মানদেবের মতো গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ সাময়িকভাবে অচল হলে তার অভিঘাত ছড়িয়ে পড়ে বিশ্ববাণিজ্যে। তাই হুতিদের হুমকি তাদের নিয়ন্ত্রিত ভূখণ্ড কিংবা অস্ত্রের সংখ্যা দিয়ে মাপলে ভুল হবে। আসল বিষয় হলো, তারা কত কম খরচে সৌদি আরব ও বৈশ্বিক বাণিজ্যের ওপর কত বড় কৌশলগত অনিশ্চয়তা চাপিয়ে দিতে পারে। হুতিরা সৌদি আরবের এমন এক দুর্বলতা সামনে এনেছে, যার সমাধান শুধু অর্থ, অস্ত্র কিংবা উন্নত সামরিক প্রযুক্তি দিয়ে সম্ভব নয়। সৌদি আরব হুতিদের বিরুদ্ধে অনেক লড়াইয়ে জিততে পারে। কিন্তু সংঘাতের কৌশলগত সমীকরণ বদলাতে না পারলে হুতিদের হয়তো যুদ্ধ জেতার প্রয়োজনই হবে না।

লেখক : গবেষক ও কলামিস্ট, লন্ডন থেকে
raihan567@yahoo.com

ঘাটতির ভুল পাঠে বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্যে আসল প্রশ্নটা অন্য জায়গায়

ফিরে দেখা

মোঃ হাবিবুর রহমান সাগর
শিক্ষার্থী

ছয়ের বিপরীতে এক। বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্যের হিসাব এখন এই অঙ্কেই মুখস্থ। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ভারত থেকে আমদানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০.৯৬ বিলিয়ন ডলারে, আর ভারতে রপ্তানি আটকে আছে ১.৭৫ বিলিয়নে। আমরা যত ডলারের পণ্য কিনেছি, বেচতে পেরেছি তার ছয় ভাগের এক ভাগের একটু বেশি। প্রতিবার এই সংখ্যা সামনে এলে প্রতিক্রিয়াও একই থাকে। কেউ ক্ষোভ ঝাড়েন, কেউ ভারতনির্ভরতার গল্প শোনান, কেউ কূটনীতির ঘাড়ে দোষ চাপান। কিন্তু প্রশ্নটা কি ঠিকভাবে করা হচ্ছে? ঘাটতি নিজে সমস্যা নয়, সমস্যা তার গড়নে। ঘাটতি কী দিয়ে তৈরি হচ্ছে, কারা তা বাড়াচ্ছে, কোন দরজা কার হাতে বন্ধ হচ্ছে, সেটাই আসল কথা। এই সম্পাদকীয় সংখ্যার ভেতরের সেই গল্প খুঁজতে চায়।

খাতার দুই পাতা : প্রথম অস্বস্তি হলো, দুই দেশের খাতায় সংখ্যা মেলে না। বাণিজ্যমন্ত্রী সংসদে জানিয়েছেন, ২০২১-২২ অর্থবছরে ঘাটতি ছিল ১১.৭০ বিলিয়ন ডলার, আর ২০২৪-২৫-এ ৭.৮৬ বিলিয়ন। অথচ ভারতীয় তথ্য বলছে, ২০২৪-২৫ সালে তাদের রপ্তানি ছিল ১১.৪৬ বিলিয়ন ডলার, আমদানি মাত্র ২ বিলিয়ন। ফাঁক সাড়ে নয় বিলিয়নের কাছাকাছি। চলতি হিসাবে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ঘাটতি প্রায় ৯.২১ বিলিয়ন ডলার। মোট বাণিজ্যের আকার নিয়েও একই ধোঁয়াশা। বাণিজ্যমন্ত্রীর মুখে প্রায় ১৩ বিলিয়ন, আর ভারতীয় সূত্রের উদ্ধৃতিতে ১২.৩৬ বিলিয়ন ডলার। যে দুই দেশ নিজেদের লেনদেনের অঙ্কেই একমত নয়, তারা সমাধানের আলোচনায় একমত হবে কীভাবে?

আরেকটি তুলনা কম আলোচিত। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ ভারতে রপ্তানি করেছিল ৬৮৯.৭৮ মিলিয়ন ডলারের পণ্য, আর আমদানি ছিল ৫.৭০ বিলিয়ন। তখন আমদানি ছিল রপ্তানির প্রায় আট গুণ, এখন ছয় গুণের সামান্য বেশি। অনুপাত কমেছে, অথচ পরম ঘাটতি পাঁচ বিলিয়ন থেকে প্রায় নয় বিলিয়নে উঠেছে। আমরা দৌড়াচ্ছি ঠিকই, কিন্তু অপর পক্ষ দৌড়াচ্ছে আরও জোরে।

ঘাটতি কি সবসময় লোকসান : ঘাটতির ভেতরে কী আছে, তা দেখলে গল্পটা বদলে যায়। ভারতের তথ্যমতে, ২০২৪-২৫ সালে বাংলাদেশে তুলা রপ্তানি ছিল প্রায় ২১৫ কোটি ডলারের, খনিজ জ্বালানি প্রায় ১০৭ কোটি, আর চাল ও শস্য প্রায় ৩৮ কোটি। এর বড় অংশ ভোগের পণ্য নয়, উৎপাদনের কাঁচামাল। সুতা, তুলা আর কাপড় এসে আমাদের কারখানায় পোশাক হয়ে ইউরোপ-আমেরিকায় যায়। সিপিডির মুস্তাফিজুর রহমান আগেই দেখিয়েছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া রপ্তানির ৮৭ শতাংশ পোশাক, যার একটি অংশ ভারতীয় সুতা ও কাপড়ে তৈরি। অর্থাৎ ভারতের সঙ্গে ঘাটতির একটা বড় অংশ আসলে আমাদের রপ্তানি-ইঞ্জিনের জ্বালানি-বিল।

এর সবচেয়ে মজার প্রমাণ সুতার বাজার। এপ্রিল ২০২৫-এ আমরা পাঁচটি স্থলবন্দর দিয়ে ভারতীয় সুতা আমদানি বন্ধ করেছিলাম। ফল কী হলো? বিটিএমএর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ভারত থেকে সুতা আমদানি প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ৩০ হাজার কোটি টাকার কাছাকাছি পৌঁছেছে। নিষেধাজ্ঞা চাহিদা কমায়নি, শুধু পথ বদলেছে এবং খরচ বাড়িয়েছে। যে বাণিজ্য বাজারের যুক্তিতে চলে, তাকে সরকারি নোটিশে আটকানো যায় না। এই শিক্ষা দুই দেশের নীতিনির্ধারকেরই জানা দরকার।

নোটিফিকেশনের লড়াই : গত দেড় বছরে দুই দেশ একে অপরের দিকে যে তীরগুলো ছুড়েছে, তার তালিকা দীর্ঘ। এপ্রিল ২০২৫-এ বাংলাদেশ সুতা আমদানি সীমিত করল। ৯ এপ্রিল ভারত বাংলাদেশি পোশাক রপ্তানিকারকদের ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা তুলে নিল। ১৭ মে স্থলবন্দরে পোশাক, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, প্লাস্টিক, কাঠের আসবাব, সুতা ও ফলের পানীয় আমদানিতে বিধিনিষেধ এল। তারপর এল পাট ও পাটজাত পণ্যের পালা। সব মিলিয়ে ভারতের এই পদক্ষেপে প্রায় ৭৭ কোটি ডলারের বাংলাদেশি পণ্য প্রভাবিত হয়েছে। পাটজাত পণ্যের মাত্র ১ শতাংশের মতো সমুদ্রপথে যেত, বাকি সব স্থলপথে। ফলে সমুদ্রপথের বিধান কাগজে রপ্তানির পথ খোলা রাখলেও বাস্তবে তা বন্ধের কাছাকাছি। পোশাকের ক্ষেত্রে স্থলপথে যাওয়া অংশ ছিল ৭৬ শতাংশ, আর বিকল্প পথে মাল পাঠাতে হলে কখনও চট্টগ্রাম থেকে কলম্বো ঘুরে নাভা শেবা পর্যন্ত যেতে হয়।

দাম দিচ্ছে দুই দেশই। বেনাপোল দিয়ে ভারতে রপ্তানি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ৩,৮১,৪৪০ টন থেকে নেমে ২০২৫-২৬-এ ১,৮৯,৩৫৮ টনে ঠেকেছে, অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক। ওদিকে সাতক্ষীরার ভোমরা স্থলবন্দরে রাজস্ব ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৯৫০ কোটি টাকার বেশি। ভারতীয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ৮.৩২ শতাংশ কমেছে। এ লড়াইয়ে কে শুরু করেছিল, সেই তর্ক এখানে গৌণ। বিশ্লেষকদের একাংশ বলছেন, ভারতের পদক্ষেপ ঢাকার আগের বাধার প্রতিক্রিয়া। আর বাণিজ্যমন্ত্রী নিজেই মেনেছেন, ভারতের দিক থেকে যেমন প্রতিবন্ধকতা আছে, গত দুই বছরে বাংলাদেশও কিছু বাধা তৈরি করেছে। দুই পক্ষই যখন স্বীকার করে বাধা দুই দিকেই, তখন তার দাম একা কেউ দেয় না।

তবু ক্ষমতার অসমতাটা অস্বীকার করার উপায় নেই। ভারতের যে পণ্য আমরা কিনি, তার অনেকটাই অন্য উৎস থেকেও আনা সম্ভব, যদিও বাড়তি খরচে। আমাদের যে পণ্য ভারত কেনে, তার জন্য স্থলপথের গতি ও দাম নির্ধারক। একটি নোটিশে সেই পথ বদলে গেলে আমাদের রপ্তানিকারকের মুনাফার হিসাবই পাল্টে যায়।

ঝুড়িটা ছোট বলেই ঘাটতি বড় : দায় শুধু সীমান্তের ওপারে চাপালে নিজেদের ঘরের প্রশ্ন এড়ানো হয়। ২০১১ সালে ভারত অস্ত্র ও মাদক ছাড়া সব পণ্যে বাংলাদেশকে শুল্কমুক্ত সুবিধা দিয়েছিল, আর আমাদের রপ্তানি প্রথম এক বিলিয়ন ডলার ছাড়ায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে। শুল্কমুক্ত সুবিধা পাওয়ার পরও ভারতের প্রায় ১.৪ বিলিয়ন মানুষের বাজারে আমাদের উপস্থিতি যে রকম থাকার কথা, তা নেই। ২০২৩-২৪-এ মোট ১.৫৭ বিলিয়নের মধ্যে পোশাক ছিল ৫৪৮.৮ মিলিয়ন ডলারের, প্রক্রিয়াজাত কৃষিপণ্য ১৫৬.৮ মিলিয়ন, আর প্লাস্টিক পণ্য মাত্র ৪৪ মিলিয়ন। অর্থাৎ ঝুড়িতে আছে মূলত পোশাক, পাট আর কয়েকটি ছোট পণ্য।

বড় ছবিটাও সান্ত্বনা দেয় না। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট পণ্য রপ্তানি প্রায় ৪৮ বিলিয়ন ডলার, আগের বছরের চেয়ে ০.৫৮ শতাংশ কম এবং ৫৫ বিলিয়নের লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে। হিসাব করলে ভারতে আমাদের রপ্তানি মোট রপ্তানির সাড়ে তিন শতাংশের কিছু বেশি। জুলাই-মে সময়ে দেশের মোট বাণিজ্য ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ২৩.৯৮ বিলিয়ন ডলার, আর রেকর্ড ৩৫.৫ বিলিয়ন ডলারের রেমিট্যান্স অর্থনীতিকে সামলে রেখেছে। ভারতের সঙ্গে ঘাটতি এই বড় ধাঁধার একটি টুকরো মাত্র। এর পেছনে আছে রপ্তানির স্থবিরতা, বিনিয়োগে অনীহা আর উৎপাদন-খরচের চাপ।

আশার আলো সামান্য হলেও আছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে ভারতে রপ্তানি ৩৩৫.২ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছে ৭.৬৭ শতাংশ বেড়েছে, যা সম্পর্ক টানাপোড়েনের মধ্যেও চাহিদা টিকে থাকার ইঙ্গিত দেয়।

খাতার বাইরের বাণিজ্য : সরকারি খাতায় যা ওঠে না, তা নিয়ে আলোচনা আরও ঝাপসা। এনবিআরের এক কর্মকর্তার বরাতে প্রকাশিত হয়েছে, দুই দেশের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক বাণিজ্য প্রায় ১১ বিলিয়ন ডলার। তবে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, এটি একটি গবেষণা-নির্ভর অনুমান। অতীতের লেখাজোখায় পাওয়া যায়, আন্ডার-ইনভয়েসিং, ভুল শ্রেণিবিন্যাস আর হুন্ডি নেটওয়ার্ক এই ছায়া-বাণিজ্যের বড় বাহন। সংখ্যাটি নিশ্চিত নয়, কিন্তু ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। স্থলবন্দরে নিষেধাজ্ঞা যত কড়া হয়, বৈধ পথ তত সংকুচিত হয় এবং ছায়া-পথের আকর্ষণ তত বাড়ে। রাজস্ব হারায় সরকার, আর যারা নিয়ম মেনে ব্যবসা করেন তারা অসম প্রতিযোগিতায় পড়েন।

এখন কী করা উচিত : প্রায় তিন বছর পর অক্টোবরে নয়াদিল্লিতে যৌথ বাণিজ্য কার্যনির্বাহী গ্রুপের বৈঠক বসেছে। ঢাকার দাবির মধ্যে ছিল স্থলবন্দরে রপ্তানির বিধিনিষেধ প্রত্যাহার, পাটজাত পণ্য ও পিইটি ফিল্মে অ্যান্টি-ডাম্পিং শুল্ক তুলে নেওয়া, আর এলডিসি উত্তরণের পরও শুল্কসুবিধা বহাল রাখা। অন্যদিকে ভারত চেয়েছে সুতাসহ কিছু পণ্যের স্থলপথে রপ্তানির বাধা তুলতে। দুই তালিকা পাশাপাশি রাখলে বোঝা যায়, লেনদেনের জায়গা আছে। প্রস্তাব রাখা যায় চারটি।

১. প্যাকেজ ফেরত। আলাদা আলাদা পণ্য নিয়ে দর-কষাকষির বদলে সুতার স্থলপথ ও পোশাক-পাটের স্থলপথ একসঙ্গে, ধাপে ধাপে এবং সময়সীমা বেঁধে খুলে দেওয়া হোক। এতে কোনো পক্ষকেই একতরফা পিছু হটতে হয় না।

২. এক খাতা, এক সংখ্যা। যে আলোচনায় এইচএস কোড সমন্বয়ের প্রসঙ্গ উঠেছে, তাকেই সুসংহত করে একটি যৌথ বাণিজ্য-তথ্যভান্ডার গড়া হোক। সংখ্যায় ঐকমত্য নীতিনির্ধারণের প্রথম ধাপ।

৩. পথের উন্নয়ন। স্থলবন্দরের সড়ক, ইয়ার্ড, গুদাম, পরিদর্শন ও কোয়ারেন্টাইন সুবিধা এবং রেল ও নৌপথের ব্যবহার বাড়ানো হোক। এগুলো দুই পক্ষই বৈঠকে তুলেছে। বন্দরের জট কমলে বৈধ বাণিজ্য সস্তা ও দ্রুত হবে।

৪.ঝুড়ি বড় করা।চামড়া, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, প্লাস্টিক, পাটের বহুমুখী পণ্য, এসব খাতে পরিকল্পিত বাজার-অনুসন্ধান দরকার। সাফল্য আসবে ভারতীয় ক্রেতার চাহিদা, মান-সনদ আর সরবরাহ-চেইন বুঝে, শুধু দরবারে দাবি তুলে নয়।

ঘরের ভেতরের সংস্কারও জরুরি। আমদানি-বিকল্প শিল্প রক্ষা করতে গিয়ে রপ্তানিমুখী শিল্পের কাঁচামালের খরচ বাড়ানো আত্মঘাতী হতে পারে। দেশীয় সুতাকলের স্বার্থ আর পোশাকশিল্পের প্রতিযোগিতা-সক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্যই হওয়া উচিত নীতির মাপকাঠি।

বাণিজ্য-ঘাটতি দেখে ভয় পাওয়া যায়, কিন্তু ভয় থেকে নীতি হয় না। ভারতের সঙ্গে ঘাটতি কমানোর সবচেয়ে কার্যকর পথ আমদানি আটকানো নয়, রপ্তানির দরজা খোলা এবং সেই দরজা দিয়ে ঢোকার মতো বৈচিত্র্যময় পণ্য তৈরি করা। দুই প্রতিবেশীর অর্থনীতি একে অপরের ওপর এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে নোটিশের পাল্টা নোটিশে কেউই জেতে না। সম্পর্ক যতই টানাপোড়েনের হোক, দুই রাজধানীর সামনে প্রশ্ন একটাই: লাভের হিসাবটা আমরা একসঙ্গে কষব, নাকি আলাদা আলাদা খাতায় লোকসান গুনব?

লেখক : শিক্ষার্থী, জার্নালিজম এন্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়